ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1634-1643
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.384

ফিরে চাও ধর্মরাজ' ও মহাভারতের আলোচনায় ভীম চরিত্রের পর্যালোচনা

রীনা বিশ্বাস, *ছাত্রী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The critical analysis of characters within the literary domain of the Mahabharata is not a new subject. In examining the traits of these characters, it is essential to understand that most of the principal figures embody a kind of epic power. This power is not ordinary; rather, it is deeply intertwined with Indian society's religion, philosophy, and ethics, transforming each character into a symbol of profound universality. Conversely, in a strikingly opposite manner, where there is an absence of ধর্ম (dharma) and moral order, injustice and immorality are also portrayed within certain characters with such epic magnitude that their force is no less significant. It is precisely here that the broader philosophical vision of the Mahabharata comes into focus.

Thus, in the history of Mahabharata literature, the epic grandeur of each hero and villain has been examined from multiple perspectives in various scholarly works. From grandsire Bhishma to Yudhishthira, Karna, Arjuna, and Duryodhana, the more these characters have been discussed in literature, the more expansive their significance has become. However, amidst this extensive body of character analysis, the position and representation of Bhima have been comparatively less explored and discussed in Mahabharata studies.

Therefore, keeping this gap in mind, the primary objective of this paper is to highlight various aspects of Bhima's character through a discussion of Akhil Ghosh's novel "Phire Chao Dharmaraj", and to analyze its importance in relation to the broader philosophical vision of the Mahabharata.

Keywords: Mahabharata Literature, Epic Power, History of Mahabharata Literature, Bhishma, Yudhishthira, Karna, Arjuna, Duryodhana, Bhima, Overall Philosophy of the Mahabharata.

"যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে অর্থাৎ মহাভারতে সবকিছু রয়েছে, এটি কেবল প্রবাদ বাক্যই নয়; মহাভারত হল সেই মহাকাব্য যার মধ্যে ইতিহাস ও দর্শন একত্রিত হয়ে রয়েছে"।[১] সেইজন্যই মহাভারতের গল্প, দর্শন ও ইতিহাস নিয়ে লেখা উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য, অনুবাদ এবং বিভিন্ন আলোচনার সংখ্যাও কম নয়। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে মহাভারত নিয়ে লেখা ও অনুবাদের ইতিহাসও অনেক বিস্তর। 'Jadavpur Journal of Comparative Literature' থেকে পাওয়া একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থবিবরণী দেওয়া হলঃ

[১] শামিম আহমেদ, *মহাভারতের নাস্তিকতা, কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ২০২০, পৃঃ ০১।*

- "Ganguli, Kisari Mohan (Tr.), The Mahabharata, Bharata Press, Calcutta, 1888-1896. This complete and faithful translation – the first of the two complete renderings into English of the epic and only edition now available- the monumental accomplishment strangely referred to by scholars and bibliographers alike, as 'the P. C. Roy translation' " [২]
- "Reed, Elizabeth A., Hindu Literature; or the Ancient Books of India. S. C. Griggs & Co., Chicago, 1891. It retells some of the important parts of Ramayana and Mahabharata. Some chapters discuss the Puranas and the cult of Krishna.[৩]
- "Onam, Joseph Campbell, The Great Indian Epics: The Ramayana and the Mahabharata. George Bell & Sons, 1894. Onam says here, " for the Indian people it is the great war ending with Kurukshetra, which is the central event of their history. It closes them for their golden age. Before that was a world of transcendent knowledge and heroic deeds; since then intellectual decay and physical degeneracy" ". [৪]
- "Hopkins, E. Washburn, The Great Epics of India. 1901. Hopkins contention is that "The Pandu-Epic, in its present form, was composed after the reek invasion (circa 400 B.C.)" [৫]
- "Horrwits, Ernst, A Short History of Indian Literature. Unwin, London, 1907. It discusses the origin of Mahabharata.[৬]
- "Roy, Dwijendra Chandra (compiler), Tales from the Mahabharata Karyalaya, Calcutta, 2nd Edition, 1912. It is taken from the Kisari Mohan Ganguli translation of Mahabharata, and revised and re-told for children"[৭]
- "Penzer, Norman A., Nala and Damayanti. A. M. Philpot, London, 1926. Penzer narrates Nala and Damayanti story with great lyrical charm and delicacy[৮]
- "Archer, W. G., The Loves of Krishna., Allen & Unwin, 1957. Archer traces the Krishna story from the Upanishad through the Mahabharata" [৯]
- "Ghoshal, U. M., A History of Indian Political Ideas. Oxford University Press, 1959. Dr. Ghoshal subjects the Mahabharata's Santi (peace) and Anusasana (advice) parvas to a meticulous seventy pages examination and emerges with a lucid presentation of the principal political ideas and theories in the epic". [১০]

---

[২] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p. 72.

[3] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p. 82

[4] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p. 78.

[5] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.75.

[7] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.76.

[7] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.83.

[8] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.79.

[9] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.76.

[১০] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature*, 1961, Jadavpur University, p.75.

- "Vora, Dhairyabala P., Evolution of Morals in the Epics. Popular Book Depot, Bombay, 1959. Dr. Vora gives copious references of promiscuity, polyandry, premarital sex relations, fidelity in wedlock, marriage taboos, and the status of women. It also includes an interesting bit on the practice of meat eating in the epic period" [১১]
- "Narayan, R. K., Gods, Demons and others. Heinemann, 1964. Retelling of legends from the Ramayana and Mahabharata by a popular Indian novelist in the English language" [১২]

তাই বলা যেতেই পারে, যে মহাকাব্যের দর্শন নিয়ে এত আলোচনা, ইতিহাস নিয়ে এত তর্ক বিতর্কের ক্ষেত্র, চরিত্রগুলির এত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক সমালোচনা, সেই মহাভারতের ভীম চরিত্রের বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব ও সমালোচনার বিস্তার আর পাচঁটি চরিত্রের তুলনায় অনেকাংশেই কম।

মহাভারতের কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা বিভিন্ন কাব্যের, গল্পের, উপন্যাসের, প্রবন্ধের আলোচনা ও সমালোচনা বর্তমান পাঠক সমাজের কাছে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এই আলোচ্য ক্ষেত্রের অনেকাংশেই মহাভারতের দর্শন ও আখ্যানের, ইতিহাস ও চরিত্রের বিভিন্ন পরিসর লেখক তার কল্পনা ও যুক্তির গভীরতায় ফুটিয়ে তোলেন। এর ফলস্বরূপ, বর্তমান ব্যস্ততায় ডুবে থাকা এক শ্রেণীর পাঠক সমাজের কাছে যখন একটা আস্ত অখন্ড মহাভারত পড়ে ফেলা সম্ভব হয় না, ঠিক তখনই এই লেখনী গুলো যতটা অবকাশ পায় ততটুকু দিয়ে এমন পাঠক সমাজকে সমৃদ্ধ করে। তবে, এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, পাঠক সমাজ বলতে আমরা শুধুই 'বিদগ্ধসমাজ'এর কথা বলছি না। বুদ্ধদেব বসুর মতানুযায়ী, পাঠক সমাজ বলতে,
"তথাকথিত সাধারণ পাঠক, চাকুরীজীবী, সিনেমাপ্রিয় মহিলা, ধনার্জনকারী ব্যস্ত ব্যবসায়ী, সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।" [১৩]

এমনই অনেক লেখনীর মধ্যে মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্ব কে অবলম্বন করে লেখা অখিল ঘোষের 'ফিরে চাও ধর্মরাজ' উপন্যাসটিতে অখন্ড মহাভারতের সামগ্রিকতার বিষয়টি না থাকলেও, ঘটনাবলীর সংক্ষেপিকরণ এমনই ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের কাছে মহাভারত নামক জটিল এবং ভারী বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী ও চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের নামকরণ থেকে আলোচনার বিষয়টি শুরু করা যাক। মহাপ্রস্থানে স্বর্গারোহনের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবদের যাত্রা শুরু হয়। পথমধ্যে দ্রৌপদী সহ অন্যান্য পাণ্ডবদের মৃত্যু ঘটলেও ভীম ও যুধিষ্ঠির যাত্রাপথে তখনও এগোতে থাকে। এমন সময়ই ভীম যুধিষ্ঠিরকে জানায় "পদযুগল ও দেহের ভার সে বহন করতে পারছে না" [১৪], সে ক্লান্ত, তখন দৃঢ় কণ্ঠে যুধিষ্ঠির উত্তর দেয় এসবের জন্য সে কোনোভাবেই ভীমকে সাহায্য করতে বা সহানুভূতি প্রকাশে ব্যর্থ, কারণ এতে তার মার্গ ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে ভীম চমকে উঠে। অনেকটা আশ্চর্যে এবং তারও বেশী অনেকটা রাগে, তিক্ততায়, আক্ষেপের স্বরে ভীম একের পর এক যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ও যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনা স্মৃতিচারণ করতে থাকে। এর মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের

[১১] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.83.
[12] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.78.
[১৩] বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৪, পৃ.৩৭.
[১৪] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ১২.

বিভিন্ন দিক প্রকাশ হতে থাকে, যা তার 'ধর্মরাজ' আখ্যাটিকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটি লেখা বেশ প্রাসঙ্গিক,

> "আমি কোনো নতুন কথা বলছি না, রাজশেখর বসুও তার সারানুবাদের ভূমিকায় মহাভারতের নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষরূপে যুধিষ্ঠিরকেই চিহ্নিত করেছেন।কিন্তু তার নায়কত্ব কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা তলিয়ে দেখা দরকার। যাঁকে সাধারণত এক দুর্বল ও উদ্যমহীন পুরুষ বলে ভাবি আমরা, ভীমার্জুনের বাহুবল ও কৃষ্ণের বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল, কৃষ্ণ, বিদুর বা ভাইদের পরামর্শ ছাড়া কোনো পদক্ষেপে যিনি অপারগ; যিনি প্রায় ধৃতরাষ্ট্র মতোই অবস্থিত, ধর্মভীরু হয়েও কখনো কখনো অবিশ্বাস্য রূপে সদাচারভ্রষ্ট - সেই যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব আমরা কোন যুক্তিতে মেনে নিতে পারি ?" [১৫]।

আবার, ইরাবতী কার্‌ভের 'Yuganta: the End of an Epoch' বইয়ের ভূমিকা পর্বে জন ব্রকিংটন জানান,

> "…and Yudhisthira remains in the background. There is no study of Yudhisthira in the book and stray remars reveal that Karve found him an uncongenial figure, yet he is central figure in the story…" [১৬] ।

তাই, এই প্রাসঙ্গিকতা কে সামনে রেখে উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যায়, এই নামকরণও কোথাও না কোথাও 'যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব' কে বা 'ধর্মরাজ' আখ্যাকে শুধু প্রশ্নের মুখে ঠেলছে না, বরং তা যুক্তির নিরিখে বিচারও করছে। এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখি, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের এই দিকটি নিয়ে কিছু লেখা অবশ্যই আছে। তবে, ভীমের যুক্তি, বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বিশ্লেষন-বিষয়টি এই উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, "ভীমের বিচারে যুধিষ্ঠিরের পাপের সংখ্যাও তো নেহাত কম নয়। অত হিসেব না করেও ভীম অনুভব করে শুধুমাত্র দুটি একটির বিচারেই ওঁর স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবার কথা। ওঁর যে কীর্তির জন্য সমগ্র ভারতভূমি ধিক্কারধনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে, যে ঘটনার জন্য আজও যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রাণতার কথা উঠলেই একটা প্রশ্নচিহ্ন আপনা থেকেই অঙ্কিত হয় মানসে, যে ঘটনাটা তার 'ধর্মপুত্র' পরিচয়টিকে উপহাসে পরিণত করেছে, 'ধর্মপুত্র' কথাটিকেই 'বক-ধার্মিক' এর সমার্থক করে তুলেছে, সেই গুরু দ্রোণাচার্যের হত্যাকান্ডের মহাপাতক কি ধর্মপুত্রকে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে দেবে?" [17]।

এবার আসি চরিত্র বিশ্লেষণ পর্বে। আপাতদৃষ্টিতে এটা যুধিষ্ঠির এবং ভীম কেন্দ্রিক লেখা মনে হলেও, অন্যান্য অনেক চরিত্রের পর্যালোচনাও লেখক খুব দক্ষতার সাথে করেছেন। আরও বলা যায়, উপন্যাসটি ভীমের স্মৃতিচারণার একটি দলিল রচনা। ভীমের লড়াই আর বাকী পাণ্ডবদের মতো শুধুই কৌরবদের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং সে লড়ে গেছে তার মা, তার স্ত্রী, তার ভাইদের বিশেষত যুধিষ্ঠিরের অস্তিত্বের জন্যও। ভীম তার অনিচ্ছা সত্বেও সন্দেহাতীত মনোভাবকে দূরে ঠেলেও মায়ের আদেশ নীরবে পালন করে গেছে। যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যলিপ্সা মনোভাবকে বুঝতে পেরেও নিঃশব্দে দাদার আদেশ মেনে চলেছে, যার ফলস্বরূপ "পাতকী হয়েছে ভীম আর পুরুষোত্তমত্ব লাভ করেছে কৃষ্ণ, একরাটত্ব লাভ হয়েছে যুধিষ্ঠিরের" [১৮]। দ্রৌপদীর উপর ভালোবাসা যেমন আবেগী ভীমকে অভিমানী করে তুলত, ঠিক তেমনই 'আদিম, বুনো প্রসাধন', 'কামকলা' হিড়িম্বার সোহাগ তাকে 'পরিতৃপ্তির পরিবর্তে অত্যাচারিত' বোধ করাত। ভীমপুত্র হওয়া সত্বেও

---

[১৫] বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৪, পৃ.৪১.

[১৬] Irawati Karve, '*Yuganta: The End of an Epoch', Orient Black Swan Private Limited, Hydrabad, P.* XV, Introduction

[১৭] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ৩২৩.

[১৮] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ৪৮.

ঘটোৎকচকে তার যোগ্য সম্মান ও মর্যাদাটুকু দিতে পারেনি, তা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ ও করে গেছে। এ প্রসঙ্গে, পরশুরামের 'পুনর্মিলন' গল্পটির কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে ভীম, হিড়িম্বা এবং ঘটোৎকচ কে নিয়ে এক সুন্দর হাসির খোরাক জমানো উপস্থাপনা আছে। যাই হোক, এত কিছুর পরেও, ভীম তার পাণ্ডবভাইদের আদেশ পালন করে, দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গেছে। জরাসন্ধ বধের পর ভীমের আত্মধিক্কার, কর্ণের পরিচয় জানার পর তীব্র অনুশোচনা, ইত্যাদি পরিসরগুলি ভীম-চরিত্রে এক অন্য মাত্রা আনে। আরও বলা যায়, আমরা ছোটবেলা থেকেই, যেখানে যুধিষ্ঠির, অর্জুন এবং অন্যান্যদের বীরত্বের কাহিনীর পাশাপাশি তাদের জীবনদর্শনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হতে দেখেছি, সেখানে ভীমকে শুধুই তার বাহুবল, তার শারীরিক ক্ষমতার আদিরূপাত্মক হিসেবে পেয়ে এসেছি। এ প্রসঙ্গে কার্‌ভে বলেছেন,

> "Whatever he (Yudhisthira) got was through the valour of others. His beautiful wife, his powerful father-in-law, he owed to Arjuna andfor protection in both exiles, he was indebted to Bhima" [19]।

অনেকক্ষেত্রে পাঠকগনের কাছে ভীম চরিত্রটি বেশি হাস্যকর এবং কম রাশভারী হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসে ভীম চরিত্রের উপস্থাপনা এই মিথকে অনেকখানিই ভেঙে দিতে সক্ষম হচ্ছে। এখানের প্রেমিক-ভীম তীব্র আবেগী,

> " 'দ্রৌপদী! দ্রৌপদী! তোমার জন্য ব্রহ্মশিরকেও উপেক্ষা করেছি, যক্ষ –রক্ষ-গন্ধর্ব-মানব যেই হোক না কেন তোমার অসম্মানকারী, সবার সঙ্গে আমি লড়েছি মৃত্যুর ভয়কে তুচ্ছ করে! কৃষ্ণা! তোমারই প্রতীক্ষায় যৌবন জীবন অতিবাহিত করেছি! তুমি কি বোঝোনি তা?' চলতে চলতে আপনমনে বলতে থাকে ভীম; ব্যর্থ যৌবনের হাহাকারের আজ প্রৌঢ়ত্বে ওর মুখ থেকে যেন প্রতিধ্বনি বেজে যাচ্ছে, 'আজ এই জীবনের শেষ সময়ে এসেও আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, যদিও তুমি সাথে নেই এখন, চলে গেছ জীবনের ওপারে, তবু প্রশ্ন জাগে, কৃষ্ণা! তুমি কি সত্যিই বোঝ নি আমার মনের ব্যাকুলতা, নাকি বুঝতে চাও না?'" [২০]

এখানের পিতা-ভীম সন্তানের জন্য কষ্ট পায়, "মাতৃসদৃশ মুখাবয়বটিকে বাদ দিলে ঘটোৎকচ যেন ছায়াভীম। সেই পরিঘ তুল্য কড়ীশূণ্ডেড় মত বলিষ্ঠ বাহু, শালপ্রাংশু ঊরু, সেই সুদীর্ঘ দেহ, বিশাল চওড়া বুকের ছাতি– সব মিলিয়ে নকল ভীম যেন একটা; আর, ভীমের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যা সাদৃশ্যপূর্ণ তা হল ঘটোত্কচ জাতক্রোধ এবং অতুল দেহবলে বলীয়ান ছিল। পিতামহ ভীষ্মও নাকি ওকে অতিরথ বলে জ্ঞান করতেন। হায় ঘটোতকচ! ভীমপুত্র হওয়ার যোগ্য মর্যাদাটুকু ও পায় নি কোনওদিন। জন্মক্ষণেই ওকে ত্যাগ করেছিল ভীমেরা। রাক্ষসী মায়ের তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েছে সে। পান্ডব বংশের প্রথম কুমার হয়েও তাঁর স্থান ছিল জঙ্গলেই। ও তবু কোনও খেদ রাখেনি মনে এজন্য। তবু পিতা ভীমের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল সে।...যখনই ভীম বা যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন পড়েছে, ছুটে এসেছে, ক্রীতদাসের মতো খেটেছে নির্দ্বিধায়। প্রয়োজন ব্যতীত তো ওকে স্মরণেই রাখা হয়নি কোনও কালে" [২১]।

বুদ্ধদেব বসুর মতানুযায়ী, "আমরা দেখিছি ভীমকে, যখন দ্যূতসভায় চন্ডমূর্তি ধারণ করেছেন তিনি, চাইছেন যুধিষ্ঠিরের বাহু দগ্ধ করতে, যখন তাঁর ক্রোধ তাঁর প্রতিটি রোমকূপ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে– যেন জলন্ত কোনো গাছেন গা থেকে 'সমূধস্ফুলিঙ্গ হুতাশন' (সভা; ৬৬, ৬৯,৭০); ...আর বলবান ভীম প্রতিহিংসায়

---

[১৯] Irawati Karve, '*Yuganta: the End of an Epoch', Orient Black Swan Private Limited, Hydrabad, p.68.*

[২০] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ১৯২.

[২১] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ২০৫.

উন্মত্ত হয়ে, নিপাতিত ও নিঃসহায় দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করলেন (শল্য ; ৬০); ...এবং দেখেছি আকিলেউসকেও, হেক্তোর যখন ভূলুণ্ঠিত ও করুণাপ্রার্থী, ভীমের মতোই নরকভুকবৃত্তির পরিচয় দিয়ে যিনি গর্জে উঠেছিলেন – 'কুকুর! তুই দয়ামায়ার কথা তুলিস না, তোর গা থেকে কাঁচা মাংস কেটে ভোজন করার মতো ক্ষুধা থাকলে তবে আমার সুখ হতো আজ।"[২২]। এমন বহুশত্রুহন্তা ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন ভীমও যুদ্ধের নৃসংসতার কাছে মাথা নত করে নিজেদের করা কৃতকর্মের কাছে প্রশ্ন করে, " কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়টা ওদের কি আদৌ জয়, নাকি আসলে পরাজয় তা ভীম আজও বুঝতে পারে না। জয়ের কি এত জ্বালা হয়? ওঁরা স্বপ্ন দেখত একটা যুদ্ধের, যে যুদ্ধের অবসানে সূচনা হবে এক নতুন প্রভাতের, যে প্রভাতের কল-কাকলিমুখর কিরণজাল সমস্ত গ্লানি-মলিনতা দূরীভূত করবে, যে প্রভাতের সুগন্ধিত বাতাস অন্তরের সমস্ত ক্ষতগুলিকে নিরাময় করে দেবে।...যুদ্ধে ওদের তথাকথিত জয় হল ঠিকই, কিন্তু প্রভাতের শোণিত গন্ধযুক্ত বাতাস হৃদয়ের ক্ষতগুলিকে ঘুলিয়ে দিতে লাগল হাজারো বিষ জ্বালায়।...ভীমের অন্তরেও হাহাকার ভরিয়ে দিয়ে গেল। হায় ! জীবনে যা কিছু অপরিপূর্ণ ছিল তা পূরণ করতে চেয়েছিল যে যুদ্ধের মাধ্যমে, সেই যুদ্ধই তো আরও নিঃস্ব করে দিয়ে গেল। আত্মীয় বান্ধব সুহৃদ পুত্র পিতা পিতামহ গুরু শিষ্য সবাইকে কেড়ে নিয়ে গেল কুরুক্ষেত্র। হাজার হাজার সদ্য বিধবার অন্ধকারাচ্ছন্ন আগামী, বার্ধ্যক্যের সহায়রুপ পুত্রের অকাল বিয়োগে লক্ষ লক্ষ পিতার দীর্ঘশ্বাস, শূন্যক্রোড় অযুত জননীর গুমড়ে গুমড়ে কান্নার রব, অজস্র পিতৃহারা অনাথ শিশুর করুণ চাহনি এসবই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপহার ওদেরকে। হস্তিনাপুরকে খা খা শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে গেল। "[23]

এখানের প্রতিবাদী-ভীম দৃঢ় কণ্ঠে যুদ্ধের বিরোধিতা করে প্রশ্ন করে বসে, "যুদ্ধটা কি এড়ানো যেত না একেবারেই?" [24]।

এখানে দার্শনিক-ভীম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের অর্থ খুঁজতে তীব্র চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভীমের স্মৃতিচারণই ভীমের চরিত্র পর্যালোচনার এক অন্য ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু তাই নয়, দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের ঈর্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা এবং শ্রদ্ধার দিকটিও ভীমের নজরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্ত্রহরণ মুহূর্তে কুরুবৃদ্ধরা কেন নীরব সেই প্রশ্ন ভীম পাঠকের কাছে তুলে ধরেছে। কুন্তীর সংকোচকে অনবরত প্রশ্ন করে গেছে ভীম, "প্রজ্ঞাবতী কুন্তীর তো অজানা ছিল না যে, সমাজে কানীন পুত্র স্বীকৃত এবং বিবাহোত্তর সময়ে জাত সন্তানদের সঙ্গে সে সম মর্যাদা, সম গোত্র এবং সম পিতৃপরিচয় প্রাপ্ত হবে! সেক্ষেত্রে পাণ্ডুপুত্র বলেই তো ধরা হতো কর্ণকে। তাছাড়া কর্ণ তো যার-তার ঔরসজাত নয়, সূর্যদেব তার পিতা। তাহলে কীসের লজ্জা, কীসের কুণ্ঠা ছিল পৃথার ? বরং সে তো ছিল গৌরবেরই বিষয় !" [25]।

জন্মান্ধ হবার সাথে সাথে পুত্র-স্নেহে-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর সিংহাসনলোভী, ক্ষমতাগৃধ্ন চরিত্রের তীব্র নিন্দা করতেও সে পিছপা হয়নি। এভাবেই, ভীম তার প্রতিবাদী স্বত্বাকে কথকের স্থানে রেখে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলোর সাথে সাথে, আর্যসমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরো টুকরো চরিত্রগুলোরও সূক্ষ্ম দিক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে।

---

[২২] বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৪, পৃ. ৯৪.

[২৩] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.১৯৭.

[২৪] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.২৬০.

[২৫] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.২২০.

সমস্ত ধরনের রাজনীতির সূক্ষ্ম আলোচনা, চরিত্রের জটিলতা, ঘটনার ঘনঘটা এসবের বাইরেও এই উপন্যাসটিকে একটি যুদ্ধ বিরোধী রচনা হিসেবে দাবি করা যেতেই পারে। যুদ্ধকালীন কূটনীতি, ভয়াবহতা এবং যুদ্ধ পরবর্তী যে হাহাকার, আর্তনাদ তার এক জ্বলন্ত চিত্র এই লেখাতে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ভীষণভাবে মনে পড়ে, বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'প্রথম পার্থ' তে, দ্রৌপদীর কল্পনায় উঠে আসা যুদ্ধের আসন্ন ভয়াবহ অবস্থা, যা তার চূড়ান্ত জেদি মনকেও যুদ্ধ নিয়ে সংশয়ে ফেলে দেয়,

"দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন, দুর্যোধনের উরু চূর্ণ-কিন্তু শুধু তাই নয়
আরো হবে, আরো অনেক -যা আমি চাইনি, এখনো চাই না।
আরো অনেক হত্যা, আরও অনেক মৃত্যু - হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা
পুনরাবৃত্ত। বলি হবে সজ্জনেরাও, বালকেরাও..." [26]।

দ্রৌপদীর এই ভয়, সংশয়কেই যেন এই উপন্যাসে লেখক তার কল্পনায় বাস্তব রূপ দিয়েছেন,

"ওদের রাত পোহাতে লাগলো হাজারো মানুষের বুক চাপড়ানোর শব্দে। হাহাকার ধ্বনি মুখরিত সকালই দেখতে পেল ওরা। পথে হাহাকার, ঘাটে হাহাকার, আকাশে হাহাকার, বাতাসে হাহাকার, বৃক্ষলতাগুল্মতৃণে হাহাকার, কুটীরে হাহাকার, সুরম্য রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে হাহাকার, অন্তরে অন্তরে হাহাকার" [27]।

আবার অন্যদিকে, শুধুই যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতি এবং যুদ্ধের বিরোধিতা করেই লেখক থেমে থাকেননি। বরং, ভীম-চরিত্র কে সামনে রেখে পাঠক সমাজের কাছে, "বিনাশ না করেও তো উদ্ধার করা যেত পিতৃরাজ্য" [28]। এমন বিষয়ও উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, "প্রথম পার্থ" তে দ্রৌপদী যেমন যুদ্ধ বিকল্প হিসেবে এক অন্য পন্থার কথা বলেছেন,

"কিন্তু আছে এক অন্য পথ,
সপক্ষে নয়, বিপক্ষে নয় - বিবিক্ত
ত্যাগ নয়, অত্যাগ নয় - নির্লিপ্ত।" [29]

আবার অন্যদিকে, শামিম আহমেদ, তার মহাভারতের নাস্তিকতা গ্রন্থে বলেছেন, "আচার্য আনন্দবর্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকেই সহমত যে মহাভারতের মূল আখ্যান যুদ্ধবর্ণনা হলেও যুদ্ধবর্ণনাই তার মূল লক্ষ্য নয়। মহাকাব্যের উদ্দেশ্য হল, শান্তিপর্বে পৌঁছানো। মহাভারত নামক বৃক্ষের ফল হল শান্তিপর্ব" [30]।

ঠিক তেমনই, এই উপন্যাসে ভীম-চরিত্রও এমন অনেক যুক্তি তার সাহস, দৃঢ়তা এবং প্রতিবাদের স্বরে তুলে ধরেছে, যা যুদ্ধ নামক বিনাশের পথে না গিয়েও রাজ্য উদ্ধারের কাজটি অনায়াসে করা যেত। যুদ্ধ বিরোধী এবং যুদ্ধ বিকল্প পন্থাগুলো এই উপন্যাসের এক অন্যতম সংযোজন, যা ভবিষ্যতের পাঠকদের আলোচনা সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতেই পারে।

এবার আসি অন্য পরিসরে। খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে বোঝা যায়, আমাদের নিত্যদিনের সংসারে হাজারো চরিত্রের প্রতি ক্ষেত্রেই মহাভারতের গল্প গাঁথা আছে। সেইজন্য বলে হয়তো, মহাভারত এমনই প্রতিদিনের সংসারে ঘটতে থাকে ঘটনার এক অন্যতম লিখিত স্বরূপ। এর জীবনদর্শনই এর নিস্কর্ষ। এই উপন্যাসে ভীমের স্মৃতিচারণ বারবার তাকে জীবনের অস্তিত্ব-উদ্দেশ্য-প্রাপ্য, ভালো-খারাপ, পাপ-পুণ্য, বন্ধু-শত্রু, আপন-

---

[২৬] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.১১৮.

[২৭] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.১৯৬.

[২৮] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.২২৩.

[২৯] বুদ্ধদেব বসু, 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, ১৯৬০, পৃ. ১২৫.

[৩০] শামিম আহমেদ, 'মহাভারতে নাস্তিকতা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ০৯, জানুয়ারি ২০২০, পৃ.০১.

পর ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করে। যখন যুধিষ্ঠির তার অনুগত ও শরণাগত কুকুরের জন্য স্বর্গ ছাড়তে রাজি হয়, ভীম তখন প্রচন্ড তিক্ততায়, তীব্র ঘৃণায়, অসহ্য জ্বালায় বলে ওঠে, "ভাইদের আজ আপনি কোথায় নামিয়ে দিলেন ধর্মরাজ! ...কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট করে দিলেন তাদের!" [31]। মনে পড়ে যায়, কিছুদিন আগেই, এই লেখকেরই লেখা "খালাস" নামক একটি গল্পের কথা। গায়ে কাঁটা দেওয়া এক মুহূর্ত সেখানে বর্ণিত, যেখানে দারিদ্রে জর্জরিত নেপুর পোয়াতি বউ চিকিৎসার অভাবে ঘরে গোঙাতে গোঙাতে মরে আর অন্যদিকে নেপুর মা তার বিশহাজারি গরুর সদ্যোজাতর জন্য ডাক্তার আনে, কারণ,

"নেপুরে আবার বিয়া দিয়া ঘরে বউ আনবার পাবা, কিন্তুক বিশহাজারি গোরুডা মইরা গ্যালে-" [32]।

এই তো জীবন! সবটাই বড় শূন্যতায় ভরা, সবাই বড় কঠিন, বড় জটিল, বড় বাস্তব। এখানে হিসেব মেলাতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু এসবের পরেও, এত হতাশাতেও ভীম তার সমস্ত যুক্তি-বুদ্ধি-বোধ-আবেগ দিয়ে জীবনের হিসেব মেলাতে চায়। কখনও সে তিক্ত হয়ে জীবন থেকে মুখ ফেরায়, আবার কখনও সংসারের মায়াজালে, দায় কর্তব্যে জর্জরিত হয়ে পুনরায় জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ে। তারপর, জীবনের উপান্তে এসে জীবনের প্রতি তার হঠাৎ মায়া হয়, সে বলে ওঠে, "কেমন করে যে কেটে গেল জীবনটা, বোঝাই গেল না। বাঁচাই তো হলো না ঠিকমতন" [33]। এটাই সংসার। এটাই আমাদের নিত্যদিনের ব্যস্ততা, অস্তিত্বের সংগ্রাম, টিকে থাকার গল্প, এটাই মহাভারত। এখানে সাহসী, জেদি, বলশালী বীরেরাও আর পাঁচটা নেপুর বউয়ের মতনই সাধারণ চরিত্রের মতো, জীবনের অন্তিমপর্বে গিয়ে হিসেব মেলানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। উপসংহারে তারা জীবনকে জীবনের মতো করে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করে। যাইহোক, এই সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও আলোচনার উর্ধে গিয়ে, সামগ্রিকতার বিচারে এটা অবশ্য বলতে হয়, এই উপন্যাসটি অনেকখানি জীবনমুখী, সুখপাঠ্য এবং অবশ্যপাঠ্য।

এমনকি, লেখক তাঁর সাক্ষাৎকারেও এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিস্তারিত সাক্ষাৎকারটি নিম্নে দেওয়া হল।

রীনা বিশ্বাস: আপনার লেখা পড়ে অরুনেশ ঘোষ বলেছিলেন, "আমি বাংলাদেশের প্রখ্যাত কোনও লেখকের লেখা পড়ছি।...পূর্ববঙ্গের শৈশব কৈশোরকে খুঁজে পেয়েছিলাম।" [34] আবার অন্যদিকে, 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় আপনার লেখা বিষয়ে বলা হয়েছিল,"গল্পগুলি যথেষ্ট বলিষ্ঠ। প্রান্তিক ও দরিদ্রজনের মানসিক যন্ত্রণা, আর্তি ও গভীর মর্মবেদনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মাটির কাছাকাছি অসহায় মানুষের কথা তিনি তুলে ধরেছেন নির্ভীকভাবে।" [35] অর্থাৎ, আপনার লেখায় আঞ্চলিকতার প্রাধান্য বেশি। এমতাবস্থায়, আপনি মহাভারতের মতো মহাকাব্যকে নিয়ে উপন্যাস লেখার বিষয়টি কিভাবে ভাবলেন?

অখিল ঘোষ: আসলে শৈশব কৈশোরে মহাভারত আমার ব্যক্তিগতভাবে দৈনন্দিন জীবনেরই অঙ্গ ছিল। আমার পিতা সুরেশ চন্দ্র ঘোষ একজন দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। জীবনযুদ্ধে খাবি খেতে খেতে দিনশেষে বাড়ি ফিরে নিয়ে বসতেন মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি। তারই মতো আরও কিছু হতদরিদ্র জীবনযুদ্ধে অবসন্ন কিছু মানুষও এসে জুটতেন সে সময়। বাবা পাঠ করতেন, তারা তন্ময় হয়ে শুনতেন। আমিও শুনতাম পড়াশুনার ফাঁকে অথবা পড়াশুনা ফাঁকি দিয়ে। এক অমোঘ আর্কষণে মন ছুটে যেত সেই পাঠ শুনতে। কখনও ঠাকুরের আসন থেকে শালুকাপড়ে মুড়ে রাখা মহাভারত নিয়ে নিজেই পড়তে থাকতাম। মহাভারত

---

[৩১] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.৩২৮.

[৩২] অখিল ঘোষ, 'খালাস', কবিতীর্থ, কলকাতা- ২৩, জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১৮.

[৩৩] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.২৯৭.

[৩৪] অখিল ঘোষ, 'খালাস', কবিতীর্থ, কলকাতা- ২৩, জানুয়ারি ২০১০, মুখবন্ধ.

[৩৫] কাকলি চক্রবর্তী, 'খাসা গল্প', সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৭ জুলাই ২০১০.

আমার কাছে গল্পের বা আকর হিসেবে ধরা পড়েছিল সেই কৈশোরবেলায়। মহাভারতীয় চরিত্রগুলি ভীষনভাবে মনে প্রভাব ফেলেছিল। আবার, একটু বড় হয়ে মহাভারতে ধর্মের মোড়কে অধর্মগুলো চোখে পড়তে লাগল। মহাপ্রস্থানের বিষয়টি মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। দীর্ঘদিন একসাথে থাকা একান্ত আপন মানুষগুলোকে এক এক করে চলে যেতে দেখেও নির্বিকার যুদ্ধিষ্ঠিরকে ভীষণ স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর মনে হতো। পরবর্তীতে প্রত্যন্ত গ্রামে বসে যতটুকু মহাভারতের সমালোচনা পড়ার সুযোগ হয়েছে, তার দ্বারাই মহাভারতে বর্ণিত ন্যায়নীতি, ধর্ম-অধর্ম বিষয়ে মনে প্রশ্নের বীজ উত্তপ্ত হয়েছে। আর, আমি যে পরিমন্ডলে বড় হয়েছি, সেখানে শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কঠিন সংগ্রাম আমার চোখ এড়ায়নি কখনও। মহাভারতের কাহিনীও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের গল্পই বলে।

রীনা বিশ্বাস: আপনার লেখা 'প্রবাহ' গল্পে মরা রায়ডাকের খরতর প্রবাহেও নিখিলের পাটের জাঁক খুঁজে পেয়ে কাঁদতে থাকা, 'দুলারী' গল্পে ছাপান্ন বছর বয়সি ধানু মুচি তার পোয়াতি বউ লছমিকে নিয়ে সমাজের তোয়াক্কা না করে শুধু কন্যা সন্তান পাওয়ার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়া, এমন নিয়ত সমাজে ঠোক্কর খাওয়া, তারপরেও থেমে না থাকা চরিত্রের মাঝে ঐশ্বরিক শক্তিতে মহিমান্বিত 'ভীম' চরিত্র নিয়ে লেখার কথা কেন ভাবলেন?

অখিল ঘোষ: ভীমকে আমার মনে হয়েছে এ লড়াইয়ের একনিষ্ঠ সৈনিক। অন্যদের লড়াইয়ের বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য ছিল, স্বার্থের নগ্ন ও সূক্ষ নানান সিদ্ধিকাম ছিল। ভীমকে সেখানে আমার মনে হয়েছে বিশুদ্ধ যোদ্ধা বা সৈনিক।

মহাভারতের ঐশ্বরিক বা অলৌকিক আবর্জনাটুকু সরিয়ে দিলে, মহাভারত যেন আমাদেরই পরিবারের, সমাজের এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলের চিরচেনা চিত্র। মৃত্যুমুখে প্রায় প্রতিটি সাংসারিক জীব জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব নিয়ে বসে এবং প্রায় প্রতিটি মানুষের হিসেবের খাতায় অপ্রাপ্তির আলেখ্যই প্রতিভাত থাকে। ভীম যেন সংসারের প্রয়োজনে নিয়োজিত অনলস সংসারী জীব। জীবন সায়াহ্নে এসে সেও খুলে বসেছে তার খাতা। সেখানে অনিবার্যভাবেই এই অপ্রাপ্তির হাহাকার এ উপন্যাসে সংসারে প্রতিটি লড়াকু মানুষের সেই অন্তিম হাহাকারের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ভীম ক্ষয়িষ্ণু যৌথ পরিবারের সেই চরিত্রকে তুকে ধরেছে যে পরিবারের বটগাছসম অগ্রজ বা কর্তাব্যক্তির প্রশ্নাতীত অনুসরণে রয়ে গেছে চিরবঞ্চিত হয়ে।

প্রাবন্ধিক কর্তৃক নেওয়া সাক্ষাৎকার:

তথ্যদাতার নাম : অখিল ঘোষ

বয়স : ৪৯

পেশা : শিক্ষকতা

ঠিকানা : বালাকুঠি (জোড়াইমোড়), থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার, পিন নম্বর- ৭৩৬১৩১।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৭.০২.২০২৩

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : কোচবিহার।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

- অখিল ঘোষ, 'খালাস', কবিতীর্থ, কলকাতা- ২৩, জানুয়ারি ২০১০.
- অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২.
- কাকলি চক্রবর্তী, 'খাসা গল্প', সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৭ জুলাই ২০১০.
- বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৪.
- বুদ্ধদেব বসু, 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, ১৯৬০.
- শামিম আহমেদ, 'মহাভারতে নাস্তিকতা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ০৯, জানুয়ারি ২০২০.
- Irawati Karve, 'Yuganta: the End of an Epoch', Orient Black Swan Private Limited, Hydrabad.
- P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', Jadavpur Journal of Comparative Literature, 1961, Jadavpur University.